ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু কটুক্তির জবাব

আবুসাইদ মাহফুজ

(আমার এ লেখাটা মূলতঃ বেশ কিছু ওয়েব সাইটে ইসলাম সম্পর্কে আপত্তিকর বেশ কিছু প্রবন্ধের জবাব। সময়ের স্বল্পতাসহ অনেকগুলো জটিলতা থাকলে ও চেষ্টা করবো আগামী কয়েক সংখ্যায় বেশ কিছু আপত্তিকর প্রশ্নের জবাব দিতে।)

এক.

মহামতি সক্রেটিস একবার বহুদুর গিয়েছিলেন একজন লোকের কাছ থেকে কিছু জ্ঞান আহরণের জন্য কিন্তু তিনি নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি নিরাশ হয়ে ফিরলেন, তখন সক্রেটিস যার কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলেন তার সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি কিছুই জানিনা, কিন্তু তিনি দেখছি তাও জানেন না"। জ্ঞানের সংজ্ঞায় কোন কোন মনীষি তো সাগরের বেলাভুমিতে দাঁড়ানোর উদাহরন দিয়েছেন যে যত জ্ঞানই আমরা অর্জন করি না কেন, জ্ঞানের সাগরে তা বেলাভুমিতে দাঁড়ানোরই শামিল। ইমাম আবুহানিফা বলেছেন, "আমি একটা জিনিস নিশ্চিত জানি" লোকজন জিজ্ঞেস করলেন কি সেটা, তিনি বললেন, "আমি যে কিছুই জানি না এটা আমি নিশ্চিত জানি"।

বই পুস্তক ঘাটাঘাটি করলে জ্ঞানের সংজ্ঞাটা এভাবে দাঁড়ায় যে, একজন জ্ঞানীর সংজ্ঞা হলো যিনি নিজের অজ্ঞতা, সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা আঁচ করতে পারেন। আর একজন মূর্খের সংজ্ঞা হলো যিনি সবসময় নিজেকে খুব জ্ঞানী মনে করেন। কথা আছেনা "খালি কলসি নড়ে কিন্তু ভরা কলসি নড়ে না।" কথাটাকে আমি এভাবে উদাহরন দেই, মনে করুন আপনি বসে আছেন একটি বদ্ধ ঘরে। বাইরে তুফান হচ্ছে, বাইরে সাগর রয়েছে। কিন্তু আপনি মনে করছেন বাইরে কিছুই হচেছনা। আপনি যদি দরজা বা জানালা খোলার সুযোগ পান তখনই বুঝতে পারবেন বাইরে তুফান বয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান হলো বাইরের এ জগৎ, তুফান, সাগর, বিশাল আকাশ। যারা দরজা জানালা খুলেছেন তারাই কিংবা অন্ততঃ দরজার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারার সুযোগ পেয়েছেন তারাই বুঝতে পারবেন, বাইরের এই ঝড়, ঝাপটা, তুফান, সাগরের তুলনায় আমি তো ছোট্র একটা ঘরেই বসে আছি। কুয়ার ব্যাঙ কুয়াকেই পৃথিবী মনে করে।

দুই।

বেশ কিছু দিন থেকে ইন্টারনেট জগতে ইসলামের বিরুদ্ধে বেশ লেখালেখি হচ্ছিল। বিশেষতঃ ওয়ার অন টেররিজমের পর অনেকে তো আনন্দে আটখানা এই ভেবে যে ইসলামকে একহাত দেখিয়ে নেয়ার এটাই বোধ হয় মোক্ষম সময়। কিছু কিছু লেখা তো সভ্যতা ভব্যতার সীমা এত ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, কোন রুচিবান লোক পড়তে কষ্ট পাবেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে (প্রদত্ত তথ্য যদি সত্য হয়) জনৈক লেখক তো ইসলামের যৌননীতি আলোচনা করতে গিয়ে রীতিমত পর্ণো ম্যাগাজিন উপযোগী গল্প রচনা করেছেন। ইসলামের নবী এবং আয়েশা (রা), বিয়ে সম্পর্কে, ইসলামের নারী পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে এমন কিছু লেখা এসেছে যা সত্যিই রুচিহীন। স্বভাবতই অনেক মুসলমান এতে আহত হয়েছেন। বন্ধু মহলের অনেকেই এ ব্যাপারে কলম ধরার জন্য বার বার বলছিলেন। আমি বারবারই তাদেরকে বলেছিলাম এটা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই। আমি তাদেরকে এবং অন্য যে সব মুসলমান যাঁরা ঐ সব লেখা পড়ে কষ্ট পান তাদেরকে বলবো কষ্ট না পাবার জন্য। কারণ এ সমাজে তো অনেক পর্ণো ম্যাগাজিন আছে। তাছাড়া ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা, বলা আজ নতুন নয়। এগুলো শুধু চর্বিত চর্বণ। তাই তাদের লেখার কোন জবাব দিয়ে তাদের গুরুত্ব বাড়ানোর কোন ইচ্ছা আমার নেই। আমার এ লেখা মূলতঃ ঐ সমস্ত মুসলমানের জন্য যারা ঐ লেখাগুলো পড়ে আহত হয়েছেন। যারা দ্বিধান্বিত হয়েছেন। আসলেই কি, ইসলামে এ সমস্যাগুলো রয়েছে? মুসলমানরা জানা উচিত আসলে ফ্যাক্টটা কি।

এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথাগুলো বলার আগে একটা বিষয়ে আজ বলতেই হয় তা হলো ডিগ্রী। পরিচিত বেশ কিছু ওয়েব সাইটে এ লেখাগুলোর অন্যতম প্রধান আকর্ষন ছিল ডিগ্রী নিয়ে বাহাদুরী। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আসলেই আমার হাসি পাচ্ছে। আসলেই কিছু লিখবো কিনা ভাবছিলাম, লেখা উচিত হবে কিনা।

তাহলে একটা গল্প দিয়েই শুরু করি। গল্পটি সম্ভবতঃ মরহুম ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামালের বলা। গল্পটি দু' অক্ষর সমন্বয়ে গঠিত একটি উচ্চতর ডিগ্রী সম্পর্কে। এক ব্যাক্তি বিদেশ গিয়ে বহু টাকা কামাই করেছেন, যেভাবেই করেন না কেন। এবার দেশে যাবার পালা, কিন্তু দেশে যেতে হলে তো শুধু টাকা নিয়ে গেলে হবে না। নামের আগে লাগানোর জন্য দু' অক্ষরের একটা ডিগ্রী না হলে হয় কিভাবে। তিনি ঘোড়ায় চড়ে খুঁজতে থাকলেন কোথায় টাকার বিনিময়ে ডিগ্রী কিনতে পাওয়া যায়। পরিশেষে দেখলেন এক ব্যাক্তি গাছের নীচে বসে দু' অক্ষরের ডিগ্রী বিক্রি করছেন। লোকটি মোটা অংকের টাকা দিয়ে নামের আগে লাগানোর মত দু' অক্ষরের একটা ডিগ্রী কিনে নিলেন। কিছুদূর যাবার পর মনে করলেন, হেই, টাকা দিয়েই যেহেতু ডিগ্রী কিনতে পাওয়া যায় তাহলে আমার ঘোড়াটার জন্য একটা ডিগ্রী কিনে নিলেই হয়। তিনি ফিরে গেলেন এবং বিক্রেতাকে তাঁর ঘোড়ার জন্য একটা ডিগ্রী দিতে বললেন। তখন বিক্রেতা বললেন, ”সরি, এখানে ঘোড়ার জন্য কোন ডিগ্রী বিক্রি করা হয়না, এখানে শুধু গাধার জন্য ডিগ্রী বিক্রি করা হয়।”

সম্মানিত পাঠক, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ডিগ্রীধারী শিক্ষিত ভদ্রলোকদের কেউ কেউ মনে কষ্ট পেতে পারেন আমার এ গল্পে। তাদেরকে বলছি, আঘাতটা আমার গায়েও লাগতে পারে সবার আগে। কারণ দেশী বিদেশী মিলিয়ে ৭টা ডিগ্রী আমি ও নিয়েছি। যেসব ডিগ্রীর তিনটিই স্নাতকোত্তর পর্যায়ের। সুতরাং মনে কষ্ট নিবেন না। আজকের লেখাটা কিছুটা বাধ্য হয়েই লিখছি। আর গল্পটাও বলটি একান্ত বাধ্য হয়েই। গল্পটা আমার জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে। ডিগ্রী নেয়া আর জ্ঞানার্জন কখনো এক জিনিস নয়। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ”লোকটা বি.এ পাশ করিল কিন্তু শিক্ষিত হইলোনা ”। লেখাপড়া জেনেও মানুষ মূর্খের মত কাজ করতে পারে। এ সমাজে বহু লোক আছে একাধিক স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়েও, নামের আগে পিছে লাগানোর মত অনেকগুলো লকব অর্জন করে ও সাদামাটা নাম নিয়ে বসবাস করেন। আমার একাধিক বন্ধু আছেন যারা পি.এইচ.ডি শুধু নিজে নেননি; পি. এইচ.ডি দেন ও। তারা নামের আগে কোনদিন ড বিষর্গ বা অন্য কোন উপসর্গ ব্যাবহার করেন না। প্রফেসর এমাজ উদ্দিনের সকল বইতে নাম লেখা থাকে ”এমাজ উদ্দিন”। আমার কমপক্ষে দু'জন বন্ধুর নাম মনে পড়ছে। তাঁরা যে পি.এইচ.ডি ধারী তা জানতে পেরেছি বছরাধিককাল পরে, তাও তাদের পি.এইচ.ডি ছিল বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাদেরকে কখনো নামের আগে ড বিষর্গ বসাতে দেখিনি। লিপস্টিক আর মেক আপ দিয়ে কেউ কোনদিন সুন্দরী হতে পারে না চেহারাটা যদি আসলেই বিশ্রী হয়।

তিন।

আরেকটা বিষয় হলো শালীনতা। ইসলামের বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে এদের কেউ কেউ সাধারণ ভদ্রতার সীমা ও ছাড়িয়ে গেছেন। এক লেখক তো ইসলামের যৌননীতি আলোচনা করতে গিয়ে পর্নো ম্যাগাজিনকেও হার মানিয়েছেন। তিনি হস্তমৈথুন আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন তিনি নাকি কোরআন রিচার্স করে শেষ করেছেন কিন্তু দুঃখজনকভাবে তিনি হস্তমৈথুন শব্দই পাননি কোরানে। তাই তিনি সন্দেহ পোষন করেছেন যে, আসলেই কি হস্তমৈথুন অবৈধ? তাঁর দৃষ্টিতে হস্তমৈথুন অবৈধ হওয়া মূলত কাঠ কোল্লাদের কারসাজি। তিনি প্রশ্ন করেছেন, ” How could Islam simply deny such truth and consider masturbation as a serious moral offence and a crime?” শুধু তাই নয়, একজন মানুষ কত বিবেকহীন হলে এভাবে লিখতে পারে যে, ”I am quite certain that just like the ‘quit smoking’ campaign, this will also be a dismal failure, This is because, ‘ a standing prick and/or a wet vagina has not conscience.” এই ভদ্র লেখকের দৃষ্টিতে হস্তমৈথুন হলো একটা সহজলভ্য, নিরাপদ আনন্দ, সুতরাং এটা কেন হারাম করা হবে। এমনিভাবে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, সমকামিতা নিয়ে, তার দুঃখ হলো ইসলাম এ সমস্ত মজার জিনিসগুলো হারাম করে দিয়েছেন।

আরেক বিকারগ্রস্থ লেখক ইসলামের শরীয়া সম্পর্কে এভাবে প্রশ্ন তুলেছেন। ইসলামী শরীয়াসহ মৌলিক কিছু বিষয়ে তার প্রলাপ দেখে তাঁর মাথা সম্পর্কে আমার প্রশ্ন জেগেছে। এ সমস্ত বিকারগ্রস্থদের লেখাগুলো পড়ে আমার মনে একটা প্রশ্ন বার বার জাগছে যে, এসব লেখার আসবে উদ্দেশ্যটা কি। সম্মানিত পাঠক, লক্ষ্য করবেন এসব লেখার কোন সুনির্দিষ্ট ধারা বা লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই। যদি ইসলামের বিরোধীতা করাটাই উদ্দেশ্য তাও বলতে এরা সাহসী নয়। এরা একবার আফসোস করে ইসলাম কেন হস্তমৈথুনের মত মজার জিনিসকে হারাম করলো আবার দোষ দেয় মোল্লাদেরকে। আবার দোষ দেয় তাবলীগকে নয়তো জামায়াতে ইসলামীকে, কিংবা কোন পীর সাহেবকে। কখনো আসে হাদীসের অসারতা প্রমাণ করে।

যে সমস্ত অজ্ঞরা ইসলাম এবং রাসুল (সাঃ) কুরুচীপূর্ণ কথা লিখে মজা পান তাদেরকে কয়েকটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। (১) কথা বলবেন তো সঠিক তথ্য এবং তত্ব দিয়ে লিখুন। জ্ঞানার্জন করে লিখুন। কুরুচিপূর্ণ লেখার লেখক যদিও রেফারেন্স দিয়ে লেখেন যেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। এজন্য তার লেখার অত্যন্ত কুরুচীপূর্ণ হলেও আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং তার বিষয়গুলোর উত্তর তত্ব এবং তথ্য দিয়েই ধীরে ধীরে দেয়ার চেষ্টা করবো ।

আমরা জানি ইসলাম সম্পর্কে আপনাদের ক্রোধ, ক্ষোভ আছে। (২) কিন্তু একটু হায়া লজ্জা রেখে লিখুন। আর যদি কুরুচিপূর্ণ লেখা লিখে মজা পান তাহলে দয়া করে পর্ণ ম্যাগাজিনে লিখুন। প্রেম কাহিনী লিখুন। (৩) বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসে আঘাত দিবেন না। বিশ্বাস বিশ্বাসই, কার বিশ্বাস ঠিক সেটা যাচাইয়ের স্বৈরাচারী মনোভাব পোষন করবেন না। হতে পারে তাদের বিশ্বাস ঠিক আপনাদেরটা ভুল আবার হতে পারে আপনাদের বিশ্বাসটা ঠিক তাদেরটা ভুল। ইসলাম ধর্মে বা কোন ধর্মেই আপনাদের বিশ্বাস না থাকে ভাল কথা, নিজের বিশ্বাস নিয়েই থাকুন। দয়া করে নোংরা কথা লিখে কোটি কোটি মানুষের মনে আঘাত দেবেন না। ইসলাম বর্তমান পৃথিবীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংখ্যাগষ্ঠি ধর্ম। কোটি কোটি মানুষ এ ধর্মে বিশ্বাস করে। পৃথিবীতে আরো কোটি কোটি মানুষ আছে যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে না। হতে পারে আপনি ও তাদের একজন। কিন্তু বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের প্রিয় ব্যাক্তিত্ব সম্পর্কে বেহায়ার মত কুৎসা রটনা করা চরম অভদ্রতা ।

রাসুল (সাঃ) এর বিয়ে এবং আয়েশা (রা) বয়স।

প্রথম কথা হলো। একটা বিষয়ে ভুল তথ্য হাজার মানুষের মত আপনারা ও প্রয়োগ করেছেন আয়েশার (রা) বয়স নিয়ে। আয়েশার সাথে রাসুলের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আয়েশার বয়স ছিল ১৭ (সতের), ৭ (সাত) নয়। যুগে যুগেই লেখক নামের কিছু কলংক ছিল যারাই প্রচার করেছিল যে আয়েশার বয়স ছিল সাত। অনেক মুসলমান আজকের যুগের মত না জেনে বুঝে আপনাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রচার করেছিল। এ প্রসঙ্গে মুসলমানদের জন্য এ ব্যাপারে আরো কিছু তথ্য দেয়া প্রয়োজন মনে করছি। মুসলমানরা জানা উচিত আসলে ফ্যাক্টটা কি।

এ বিষয়ে আলোচনা করার আগে একটা বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া দরকার যে, আমরা সবাই জানি আরবী মাস ধরা হয় চান্দ্রমাস নিয়ে। সৌর বৎসরের সাথে চান্দ্রবছরের এই পার্থক্য চিরন্তন। কোন লোকের বয়স যদি আরবী বা হিজরী সন অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয় সৌর বছর অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা না হয় তবে হিসাবে কিছু বেমিল থাকবেই। এ নিয়ে হৈ চৈ করা মূলতঃ উদ্দেশ্যপ্রনোদিত। যুগ যুগ ধরে এ পার্থক্য রয়ে গেছে। একই কারণের জের হিসেবেই আমরা প্রতি বছর দু'দিনে ঈদ করা নিয়ে সমস্যা পড়ি। বর্তমান বিশ্ব চলছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বলয়ে। সৌর বছরের সাথে হিজরী ক্যালেন্ডারের বেমিল দেখে ভেঙ্গে পড়ার কিছু নেই। আয়েশার বয়সের একেবারে সঠিক নিরুপন করা কঠিন। শুধু আয়েশা কেন রাসুল সাঃ জন্ম তারিখ নিয়েও তো কিছু বেমিল রয়েছে। ৫৭০ নাকি ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু প্রশ্ন হলো এটা নিয়ে এত হৈ চৈ কারা করে। আরো একটা বিষয় হলো মানুষের বয়স বা জন্মতারিখ সংরক্ষণের ইতিহাস একেবারেই নতুন। বর্তমান বিশ্বের সবচে' উন্নত এবং প্রভাবশালী দেশগুলোতেও জন্মতারিখ সংরক্ষণের ইতিহাস বেশী দিনের নয়। আমাদের দেশেও আজকের যুগেও বয়স নিয়ে গোলমাল রয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগের জন্মতারিখ তাও হিজরী সন নিয়ে বয়সের গরমিল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ নিয়ে এক বিন্দুও আর্শ্চয্য হবার কিছু নেই। আয়েশার বয়স লিপিবদ্ধ ছিল না এটাও সত্য। শুধূ আয়েশা (রাঃ) কেন সে সময় কারো বয়সই লিপিবদ্ধ করার প্রচলন

ছিল না। আয়েশার বয়স নিয়ে হৈ, চৈ হবার মূল কারণ হলো, কোন কোন ঐতিহাসিক ভুল তথ্য দিচ্ছেন যে, রাসুলের (সাঃ) যখন তার বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বা নয় অর্থাৎ তিনি ছিলেন নাবালিকা। আজকের এ লেখায় আমরা এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করবো যে না আয়েশা (রাঃ) নাবালিকা ছিলেন না। তার বয়স ছিল সতের বা আঠার।

(১) অংকে ১৭ লিখতে গেলে আমরা ১ এবং ৭ এভাবে লিখে থাকি। কিন্তু বানান করে লিখতে গেলে আমরা সতের (স, তে, র) লিখি। যার সাথে সাত বা দশের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আরবীতে সতের বানান করে লিখতে গেলে বা লিখতে গেলে ও বলতে হয় সাত এবং দশ, " সাব'আতা আশারা" সাব'আতা অর্থ হলো সাত আর আশারা হলো দশ। অংকে লিখতে গেলে আপনাকে লিখতে হবে বাংলার মত এক এবং সাত। ঐতিহাসিক অনেকে মনে করেন আয়েশার বয়স নিয়ে আরবী ভাষার এই সাত এবং দশের মারপ্যাঁচে গোল বেধে গেছে। অর্থাৎ সাবআতা আশারার শেষ শব্দ কোননা কোনভাবে মুছে গেছে বা মুছে দেয়া হয়েছে। আর তার সুযোগ নিয়েছে ইসলাম বিদ্বেষী একশ্রেণীর অসৎ লেখকরা।

(২) তাফসীরে ইবনে কাছীর সহ অনেক মুফাসসির এবং ঐতিহাসিকের মতে হযরত আয়েশা ছিলেন তার বোন আসমার চে' দশ বছরের ছোট। আল্লামা ইবনে হাজার আসক্কালানী এবং প্রায় সকল ঐতিহাসিক এবং অনেক গবেষকদের মতে আসমা (রা) ৭৩/৭৪ হিজরী সনে ১০০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। যদি আসমার (রাঃ) মৃত্যুকালে অর্থাৎ ৭৩ হিজরী সনে তার বয়স ১০০ হয়ে থাকে তাহলে রাসুলের হিজরতের সময় আসমার বয়স ছিল (১০০-৭৩ =) ২৭ বছর। আর আসমা (রা) যেহেতু আয়েশা (রা) থেকে ১০ বছরের বড় ছিলেন সুতরাং হিজরতের সময় আয়েশার (রা) বয়স ছিল ১৭ বছর। তা কোন ক্রমেই সাত হতে পারে না। আর রাসুল (সাঃ) এর সাথে আয়েশার একত্রে বসবাস হয়েছিল হিজরতের বছর দুই পরে। অর্থাৎ যখন আয়েশার বয়স ছিল ১৯।

(৩) ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, হযরত আয়েশা বদর এবং ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন। এ সংক্রান্ত অনেক হাদীস বোখারী এবং মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত আছে। এ ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিকের কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হলো বদর যুদ্ধে আয়েশার (রা) বয়স কত ছিল। হাদীস এবং ইসলামী শরীয়ার নিয়ম অনুযায়ী ১৫ বছরের কম বয়সী কাউকে যুদ্ধে অংশ গ্রহনের অনুমতি দেয়া হয়না। রাসুলের যুগেও দেয়া হয়নি। সুতরাং আয়েশা (রাঃ) সে সময় নিশ্চয়ই পনের বছরের বেশী ছিল। বদর যুদ্ধের সময় আয়েশার (রা) বয়স যদি পনের বা তার বেশী হয় তাহলে রাসুলের সাথে তাঁর বিয়ের সময় তাঁর বয়স ১৮ বা ১৯ এর কম ছিল না। বদর যুদ্ধের সময় আয়েশার বয়স যদি ৭ বা ৮ হয়ে থাকবে তাহলে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন কিভাবে?

(৪) হাদীস সমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কোরআন মজীদের ৫৪তম সুরা আলক্বামার অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের ৮ বছর আগে। অন্য এক হাদীসে বর্ণনা অনুযায়ী সুরা ক্কামার অবতীর্ণ হবার সময় আয়েশা রাঃ একজন বালিকা ছিলেন। এ সম্পর্কে আয়েশা রাঃ নিজে বলেন যে যে সময় সুরা ক্বামার অবতীর্ণ সে সময় আমি ছিলাম একজন ছোট বালিকা (যারিয়া)আরবী ভাষা অনুযায়ী যারীয়া হলো ঐ সমস্ত বালিকা যা দৌড়াদৌড়ি বা খেলাধুলা করতে পারে। যেটাকে সাধারণ ৬ থেকে ১২ বছর বয়স ধরা হয়ে থাকে। এই হিসাব থেকেও রাসুলের সাথে বিয়ে বা মিলনের সময় আয়েশার বয়স ১৭-১৮ বছরের কম হতে পারে না।

(৫) ঐতিহাসিকভাবে আমরা জানি যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসুলের সাথে তাঁর বিয়ের সময় তাঁর বয়স যদি সাত কিংবা নয় হয়ে থাকে তাহলে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে তিনি এত অল্প বয়সে এতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া অনেকগুলো হাদীস ছিল বয়সের অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত। অর্থাৎ পরিপক্ক বয়স ছাড়া ঐ বিষয়গুলো বুঝা বা হাদীস বর্ণনা করা সম্ভব ছিল না।

ঐসমস্ত লেখকরা রাসুল (সাঃ) এর বিয়ে সম্পর্কে তো অনেক মশকরা করেছেন। অনেক আদি রসের গল্প রচনা করেছেন। শুনেন, এই মহা ব্যাক্তি বিয়ে গুলির মধ্যে ছিল অতি মহৎ উদ্দেশ্য। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র আয়েশা ছাড়া আর সবাই ছিলেন বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা। রাসুল (সাঃ) এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল খাদিজার সাথে তখন রাসুলের বয়স ছিল ২৫ আর খাদিজার বয়স ছিল ৪০। মানুষের যৌবণের যে তুফান, এই তুফানের সময় এই ২৫। এই তুফানের সময়

২৫ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত তিনি কাটিয়েছেন ৪০ থেকে ৫৫ বয়স্কা রমনীর সংগে। রাসুলের জীবনে বিয়ে ছাড়া নারী ঘটিত আর কোন ব্যাপারই জড়িত ছিলনা। আবার বিয়েগুলোর পেছনে অনেকগুলো কারণ জড়িত রয়েছে। তাঁর কোন কোন বিয়ে ছিল কোন কোন গোত্রের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং বিধবার সদগতি করার উদ্দেশ্যে। এবং রাসুলের ব্যাক্তিগত জীবন পর্যালোচনা করলে কোন মুসলিম বিদ্বেষী অরিয়েন্টালিস্ট ও রাসুলের চরিত্র সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলতে পারেনি। অরিয়েন্টালিস্টরা যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন সেগুলো তাঁর একাধিক বিয়ে নিয়ে। এ প্রেক্ষিতে দুটো বিষয় লক্ষ্যণীয়। (১) রাসুলের বিয়েগুলো আমরা যেভাবেই দেখিনা কেন। এগুলো ছিল বিয়ে। অর্থাৎ উভয় পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে এবং সামাজিক স্বীকৃতিতে। উভয় পক্ষের রাজীর বিষয়টা পশ্চিমা জগৎসহ পুরো বিশ্বেই একটা প্রতিষ্ঠিত বিষয়। ইসলামে বৈবাহিক সম্পর্কের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কথা হলো, ইজাব এবং কবুল আর দু'জন স্বাক্ষী। অর্থাৎ উভয় পক্ষের সম্মতি আর সামাজিকভাবে ঘোষণা এবং স্বীকৃতি। সামাজিক স্বীকৃতির বিষয়টা এজন্যই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়েটা নিছক আনন্দ নয় বরং এর সাথে দায়দায়িত্ব জড়িত। যার সাথে মোহরানা এবং নাফাকা বা ভরণ পোষনের শর্তও জড়িত। পশ্চিমা জগত যদিও বিয়ের সময় সামাজিক স্বীকৃতির বিষয়টা গ্রাহ্যে আনেনি, কিন্তু ইসলাম বিয়ের প্রথমেই সামাজিক স্বীকৃতির বিষয়টা খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। অবশ্য পাশ্চাত্য সভ্যতা দায়দায়িত্বের বিষয়টা বিয়ের পরে নিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি বা বিবাহ বিচ্ছেদের পরেই পাশ্চাত্য আইন অনুযায়ী বাড়ী ভাগাভাগি বা সন্তানের ভরন পোষনের বিষয়টা এসে যায়। সে যাই হোক, রাসুল (সাঃ) এর বিয়েগুলো পরস্পরের মতামত এবং সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমেই হয়েছে। তাছাড়া তার প্রতিটি বিয়েই ছিল দায় দায়িত্ব গ্রহন। হযরত খাদিজাকে বিয়ে করার আগে রাসুল (সাঃ) তার ব্যাবসায়িক ব্যাবস্থাপক ছিলেন যেখানে তিনি তাঁর সততার সর্বোচ্চ সাক্ষ্য রেখেছিলেন।

আরো একটা বিষয়ে বলা দরকার যে, যারা রাসুল (সাঃ) বা ইসলাম সম্পর্কে এধরনে লেখা লিখেন তারা মূলতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্টান এবং ইহুদী অরিয়েন্টালিস্টদের লেখা থেকেই কপি করছেন। ভাল কথা তারা তো লিখবেই। মুসলমানদের কেউ কেউ তো আবার খৃষ্টবাদ বা ইহুদীবাদ কিংবা হিন্দুবাদের বিরুদ্ধে বলে আসেন বা লিখতে ও পারেন। যদিও সেটা ইসলামের শিক্ষা নয়। তবু মানুষ হিসেবে সেটা তারা করবেই, এটা তেমন বেদনার বিষয় নয়। আপনারা ও লিখুন তবে নিজের পরিচয়টা দিয়ে লিখুন। কিন্তু বেদনার বিষয় হলো আপনারা কেউ কেউ মুসলমান নাম নিয়ে ইসলামের পন্ডিত সাজেন। আর কোরান নিয়ে গবেষনায় বসেন। দয়া করে আপনাদের পরিচয় দিন তারপর কলম ধরুন। মনে রাখবেন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ বোকা নয়। একমাত্র বোকারাই অন্যদেরকে বোকা ভাবে। একমাত্র অজ্ঞরাই মনে করে করে সবকিছু বুঝে গেছি। মুক্তমনা দাবী করার বিষয় নয়, মনের মুক্ততা প্রমাণ করার বিষয়।